

সূচীপত্র :

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
পুস্তক পরিচিতি	01
লেখক পরিচিতি	02
অংশগ্রহণকারীর পরিচিতি	03
মূল বিষয়বস্তু	04
লেখকের সফলতা	05
চাঁদের গায়ে কলংক/লেখকের বিফলতা	06
উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়	07
তুলনামূলক আলোচনা	10
চূড়ান্ত পর্যালোচনা	11
তুলনামূলক গ্রন্থ	15
উপসংহার	16

পুস্তক পরিচিতিঃ

সপ্তপদী

-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরণঃ উপন্যাস

ভূমিকাঃ শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম.এ, পি-এইচ.ডি

প্রচ্ছদঃ অনিরুদ্ধ পলল

প্রথম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশের প্রকাশকঃ বিপাশা মন্ডল

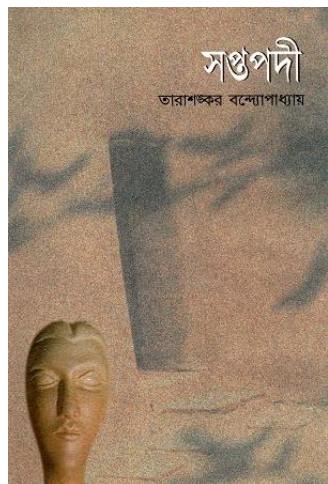
মাটিগন্ধা

৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১২০০

মূল্যঃ ১৫০.০০

পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৭৯

একমাত্র পরিবেশকঃ বিভাস





লেখক পরিচিতিঃ

নামঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মঃ ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ খ্রিঃ

মৃত্যুঃ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিঃ

সাহিত্যজীবনঃ তারাশঙ্করের প্রথম গল্প ‘রসকলি’ সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা [কল্লোল](#)-এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া [কালিকলম](#), [বঙ্গাশ্রী](#), [শনিবারের চিঠি](#), [প্রবাসী](#), পরিচয় প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

প্রথম জীবনে কিছু কবিতা লিখলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তারাশঙ্করের প্রধান খ্যাতি। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের মাটি ও মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের জীবনচিত্র, স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যক্তির মহিমা ও বিদ্রোহ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ধনতন্ত্রের বিজয় ইত্যাদি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মানবচরিত্রের নানা জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য তাঁর উপন্যাসে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজে জমিদারবংশের সন্তান হয়ে কাছ থেকে দেখেছেন কীভাবে জমিদারি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়; পাশাপাশি নব্য ধনিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে এবং দিকে দিকে কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তখন একদিকে চলছিল গ্রাম্য সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে শহরজীবনের বিকাশ। সমাজের এ নীরব পরিবর্তন তাঁর রচনায় নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-তিনি পরম যত্নের সঙ্গে মানুষের মহত্বকে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের পরে কথাসাহিত্যে যারা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তারাশঙ্কর ছিলেন তাঁদের একজন। তারাশঙ্কর প্রায় দুশ গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে [চৈতালী ঘূর্ণি](#) (১৯৩২), [জলসাঘর](#) (১৯৩৮), [ধাত্রীদেবতা](#) (১৯৩৯), [কালিন্দী](#) (১৯৪০), [গণদেবতা](#) (১৯৪৩), [পঞ্চগ্রাম](#) (১৯৪৪), [কবি](#) (১৯৪৪), [হাঁসুলি বাঁকের উপকথা](#) (১৯৪৭), [আরোগ্য নিকেতন](#) (১৯৫৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক গল্পও লিখেছেন। [বেদে](#), [পটুয়া](#), [মালাকার](#), [লাঠিঘাল](#), [চৌকিদার](#), [বাগদী](#), [বোষ্টম](#), [ডোম](#) ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। ‘রসকলি’, ‘বেদেনী’, ‘ডাকহরকরা’ প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ [ছোটগল্প](#)। তারাশঙ্করের গল্পের সংকলন তিন খন্ডে সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৭-১৯৭৯) হয়েছে। তাঁর [দুই পুরুষ](#), [কালিন্দী](#), [আরোগ্য নিকেতন](#) ও [জলসাঘর](#) অবলম্বনে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে।



অংশগ্রহণকারীর পরিচিতি

নামঃ সরোজিত কুমার দাশ

বর্তমান কর্মস্থলঃ গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট,

সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

রোল নংঃ ২৫০০০১

প্রশিক্ষণস্থলঃ বিয়াম

ক্রমিক রোল নংঃ ০১

মোবাইল নংঃ ০১৭১২৪৫৪৯০৮

মেইলঃ skdasdpi004@gmail.com

সরকারি চাকরীতে যোগদানের তারিখঃ ২০/০৬/২০০৫

মূল বিষয়বস্তুঃ

- সপ্তপদী উপন্যাসে উদার ভাব মহিমা বিভিন্নরূপে প্রতি বেশে উদাহৃত হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টান মেয়ে রিনাব্রাউনকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রিনা ব্রাউন তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ রিনা ব্রাউন মনে করে কৃষ্ণেন্দুর এই ধর্ম ত্যাগ করা উচিত হয়নি। সে একটি মেয়ের জন্য নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছে। রিনা ব্রাউনের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে পেলে কৃষ্ণেন্দু রিনা ব্রাউনকে ত্যাগ করবে।

ইহা একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। কৃষ্ণেন্দু তখন থেকে সেবারতি ধর্মযাজক কৃষ্ণস্বামী। যুদ্ধের প্রতিঘাতে বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্কগ্রস্ত জীবনযাত্রা ও বাঁকুড়া অঞ্চলের পল্লীজীবনের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়, তাহা একইসাথে বস্তুনিষ্ঠ ও সংকেতধর্মী। একটি ক্ষুদ্র আখ্যানকে ভাবমহিমাবিত করার শক্তি উপন্যাসে প্রকাশিত।

লেখকের সফলতাঃ

লেখক ব্যক্তিজীবনে কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। উপন্যাসের নাযক কৃষ্ণেন্দুও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাস করে মেডিকেল কলেজে পড়তে যায়। উপন্যাসের নাযক তার মানসপুত্র। লেখক রাঢ় বাংলার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে ভাষা শৈলী ও উপন্যাস কাঠামোর বৈচিত্র্য তারাশঙ্করের মতো যার আর কেউ দেখাতে পারেননি । এখানে লেখক অত্যন্ত সফল।

চাঁদের গায়ে কলঙ্কঃ

- চাঁদের গায়ে কলঙ্ক থাকতে পারে, তদুপ সপ্তপদীতে কিছু সামান্য ত্রুটি বিদ্যুতি নেই এ কথা বলা যায় না। ধর্মত্যাগের বিষয়টি তিনি ফলাও করে প্রচার করতে চেয়েছেন। একটি মেধাবী ছেলের সফল ডাক্তারী তিনি দেখাতে পারতেন। কিন্তু লেখক বেছে নিলেন সুন্দরী নারীর লোকে একটি সুন্দর জীবনের অবসার। লেখক রাঢ় বাংলার বর্ধমান, বাঁকুড়ার যে চিত্র দেখছেন তো খুব বেশি বলে মনে হয়। আশ্রম ত্যাগ করে কৃষ্ণস্বামী রেভারেন্ড চলে যায়। এটা কি একটু সাহিত্যের অপরিপাকতা নয়?

উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ঃ

- উপন্যাসের শুরু হয়েছে নায়ক এর বর্ণনা দিয়ে। যার পূর্ব নাম ছিল কালাচান গুপ্ত, পরে কলেজে পড়ার সময় নায়ক নাম এফিডেবিট করে হয় কৃষ্ণেন্দু। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় রাঢ় কলৌর গ্রামীণ পটভূমিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাগলা পাদ্রী অর্থাৎ সন্ন্যাসী কৃষ্ণস্বামীর কথা বলা হয়েছে। যিনি নিজেকে ভারতীয় খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বলে দাবি করে। তিনি নিজে সনাতনধর্মী হয়েও খ্রিস্টান পাদরি। এত বড় আইডেন্টিফিকেশন খুব কম উপন্যাসে পাওয়া যায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামী বাইসাইকেলে চড়ে গ্রামে চিকিৎসা করে বেড়ায়। যিনি হতে পারতেন একজন বিখ্যাত নামী ডাক্তার। তিনি কোন এক ধর্মকে গুরুত্ব দেননি। তিনি সর্ব ধর্ম সমন্বয় করেছেন। আর গেয়েছেন জীবনের জাযগান। ধর্ম এখানে বড় নয়। তার প্রধান ধর্ম সেবা, যার আরেক নাম মানব ধর্ম ।

- উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে তৎকালীন ইংরেজ সমাজ ও শিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের সমাজের একটি করুন চিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের পারিবারিক বন্ধনও দেখানো হয়েছে এই উপন্যাস। রিনা ব্রাউন যার বাগদত্তা ছিলেন সেই জন ক্লেটন রিনা ব্রাউন্কে ত্যাগ করে চলে যায়। রিনা ব্রাউন একসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে উশৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করে পরিণতিতে সে সুরাশক্ত হয়ে পড়ে।

- উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণেন্দুর বাবার মুখ দিয়ে সপ্তপদীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তিনি বুঝিয়েছেন সাত পা পথ একসঙ্গে হাটলে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়। এখানে তার অভিজ্ঞ চোখ ভুল করে না, রিনা ব্রাউন ও কৃষ্ণেন্দু গুপ্তের ভবিষ্যৎ পথ চলা। শেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় কৃষ্ণস্বামী রেভারেন্ড জন ক্লেটন ও রিনা ব্রাউনকে দায়িত্ব দিয়ে ঈশ্বরের নামে পরম মনের আনন্দে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, যা মানব জীবনের পরমপ্রাপ্তি, আধ্যাত্মিক শান্তি।

তুলনামূলক আলোচনাঃ

- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তপদী নায়ক কৃষ্ণেন্দু এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই সময়ের উপন্যাসের মাইকেল সমগোত্রীয় চরিত্র। দুই নায়কেই সমাজের প্রথম শ্রেণীর চরিত্র। দুজনেই সমাজের আদরনীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত ধর্মত্যাগী, দুজনেই মোহে পড়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। দুই উপন্যাসের নায়িকা হেনরিয়াটা এবং রিনা ব্রাউন দুজনেই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। সেই সময় উপন্যাসটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের এবং সপ্তপদী উপন্যাসে রাঢ় বাংলার চিত্র ফুটে উঠেছে।

চূড়ান্ত পর্যালোচনাঃ

“প্রেম তো চোর নয়, ডাকাতির মতো চিঠি দিয়ে আসে হত্যাকারীর মতো রক্ত নিয়ে যায়।”

এই গল্পটা রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীর। গল্পটা রিনা ব্রাউনেরও। আবার এই দুজনের গল্পে এসে মিশে গেছে জন ক্লোটনের অন্তর্ধান আর প্রত্যাবর্তনের স্রোত। ত্রিকোণ প্রেম? না, এতো সহজে দেগে দিতে পারলে হিসাবটা একটু সহজ হয়ে যেতো। ইংরেজীতে যাকে বলা যেতে পারে, **Jumping to conclusions** - সেই দশটা সিঁড়ি একবারে ডিঙিয়ে, লাফিয়ে উঠে যাওয়া যেতো ছাদে, সেরকমটা করতে পারলে মন্দ হতো না। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় সম্ভবত এইখানেই চালাকিটা করেছেন। ওই যে, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে একটা ঝোঁক থাকে না? প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রোফাইলে হাদিস শেয়ার দেয়, রাতারাতি সাধুসন্ত হয়ে পড়ে, সপ্তপদীকে যদি কেউ একদৃষ্টিতে সেরকমটা বলে, অবাক হবার কিছু থাকবে না। তবে ওই সোজাসাপ্টা ত্রিকোণ প্রেম? এটা বোধহয় বেশি বেশি হয়ে যাবে। যদিও ভালোবাসাই এই গল্পের মূল কারুকাজ করা অজগর, আর এইসব চরিত্রেরা ঘরহীন ঘরের মতো।

সপ্তপদী, ভারতীয় শাস্ত্রমতে একসঙ্গে সাত পা হাঁটলে নাকি বন্ধুত্ব হয়। বিয়েতে অগ্নিসাক্ষী করে সাত পাকে বাঁধা পড়েন স্বামী স্ত্রী। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরকে খোঁজে, তখন সে হয় পড়ে একা, হাঁটে না কারোর সাথেই। বন্ধুর সাথেও না। একেবারে একা। রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীকে যখন বিস্তীর্ণ আরণ্যক ভূমির আদিবাসীদের চিকিৎসায় নিবেদিত দেখি, সেই একাকী ছায়ার মতো তাকেও ঈশ্বরের নিরবিচ্ছিন্ন সন্ধানে নিয়োজিত মনে হয়। মানুষের মুখেই তিনি ঈশ্বরকে খোঁজেন। এই খুঁজে বেড়ানোর তাড়নার নাড়িপৌতা আছে অতীতে। নিহত স্মৃতির অতীতে। বারবার জ্বরের ঘোরে দেখা হেঁড়া হেঁড়া স্বপ্নে আমাদের নিহত স্মৃতিরা যেমন ফিরে ফিরে আসে, কৃষ্ণস্বামীরও স্মৃতির নদীতে একটা চাঁদের ইল্যুশনের মতো ভাসছে রিনা ব্রাউন। বয়ঃসন্ধির প্রেম রিনা ব্রাউন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে টালমাটাল জীবন থেকে তারাশঙ্কর আমাদের নিয়ে ফেলেন এক অতীতে।

সেন্ট জেভিয়ার্সের মাঠে ছয় ফুটের দীর্ঘ এক কিশোরের কায়াকে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হতে দেখি। দেখি কী নিপুণতায় সে বল পায়ে ছুটে যাচ্ছে গোলপোস্টের দিকে। পরক্ষণেই বল জালে জড়িয়ে গেলে উল্লসিত জনতার হুল্লোড় কানে আসে। সেই ছয় ফুটি কিশোরের কৃষ্ণ কায়াই যখন স্বর ভাঙা গলায় নির্ঝরার স্বপ্নভঙ্গী কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ক্লাসের বন্ধ দরজায় দুম-দুম শব্দে কিল-ঘুঘি বসাতে থাকে, চেতনাও তার পরবশ কম্পনে কেঁপে কেঁপে ওঠে। ফ্লাশব্যাকে রেভারেন্ড কৃষ্ণস্বামীর চামড়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিশোর কালাচাঁদকে আমরা আবিষ্কার করি সেই দূরন্ত কৈশোরে। সেই ছবির অ্যালবামটায় পা রাখে জন ক্লেটন, আর তারপরের সব ছবিকে যেন এলোমেলো করে দেয় ক্লেটন আর কৃষ্ণস্বামীর নেমেসিস রিনা ব্রাউন। এক নারীকে অধিকারের জন্য কৃষ্ণস্বামী ধর্মত্যাগ করেন। তবে সেই অধিকারপত্রে কি স্বাক্ষরিত হয় দুজনের হাতের লেখায়? এক অনিবার্য বিচ্ছেদকে আলিঙ্গন করতেই তো সমস্ত প্রেমের গল্প লেখা হয়, তাই না? ক্রমশ সেই নিহত স্মৃতির বন্ধু মাটিতে চাষবাস করে করে সপ্তপদী উপন্যাসের ফসলকে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। সহস্র আলোকবর্ষ দূর থেকে দেখা ঘুমভাঙা নক্ষত্রের স্বপ্ন থেকে উড়ে আসে এক ঐশ্বরিক আলো। সেই ভার্জিন আলোর ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত কিশোর কালাচাঁদ হয়ে ওঠে রেভারেন্ড ড. কৃষ্ণস্বামী। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় আর ঈশ্বরের খোঁজে তিনি ঘুরে বেড়াতে থাকেন আরণ্যকভূমিতে। তারপরও নিয়তিকে কি এড়ানো যায়? ভালোবাসা তো মরে, কিন্তু পিছুটান? সে তো মরে না...

সপ্তপদী নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় কনফেস করেছিলেন, এই উপন্যাসের প্রায় মেরুদণ্ডটাই দাঁড়িয়ে আছে বাস্তব ঘটনা অবলম্বন করে। দুটো আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন এক সুতোর ফাঁড়ে। সব মিলিয়ে সপ্তপদীকে কালোত্তীর্ণ ধ্রুপদী হিসেবে মানবিচার করতে গেলে অনেক ফাঁকফোকর চোখে পড়বে। ওই যে শুরুতে বলেছি, কেউ যদি মডার্ন টাইমের ক্রাইসিসের সাপেক্ষে একে দেগে দিতে চায়, আমি অন্তত সেখানে দোষের কিছু দেখি না। তবে এই কাঠগড়ায় সপ্তপদীকে দাঁড় করবার আগে কিছু বিষয় পাঠকদের খেয়াল রাখা দরকার। সপ্তপদী কোন সময়টায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই সময়ের সমাজের সাপেক্ষে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তরিত হওয়াটা কতটুকু জায়েজ? নিশ্চয়ই এটা খুব ন্যাক্কারজনক দৃষ্টিতেই দেখা হয়। এমনকি এই সময়ে এসেও। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ভালোবাসার যে ডাইমেনশনটাকে এক্সপ্লোর করেছেন সেই আত্মিক দিকটা হাল আমলের লেখকদের দুএকজনের লেখাতেও দেখি। শুধু ন্যারেটিভ আর সেটাপটাই চেঞ্জ হচ্ছে, গল্পটা কিন্তু একই আছে। সেই হিসেবে সেই ক্লিশে গল্পটাই কিন্তু রি-সার্কুলেট করছে নানাভাবে। তা বাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলার উপরে যে শুধু অর্থনৈতিক ডামাডোল, দুর্ভিক্ষ হয়েছে এইরকম চিত্র হরদম সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আসলেও সে সময় ভারতের অ্যামেরিকান সোলজারদের ইনভলভমেন্ট হয়েছিলো কিনা, সেই বিষয়টা সন্দেহাতীত হয়ে গেছে। কারণ, সপ্তপদীতে জ্বলজ্যান্ত চরিত্র হিসেবেই এসেছে একজন অ্যামেরিকান সৈন্য।

সপ্তপদীর ন্যারেটিভটা অনেকটা মঞ্চনাটকের মতো। প্রতিটা অধ্যায়ের শুরুতে যাত্রাপালার বিবেকের মতো এক ঝাঁপি দার্শনিক কথাবার্তা, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর আর নিয়ত সংক্রান্ত আলাপে জর্জরিত করে মূল গল্পে ঢোকা হয়েছে। তাই শুরুর আবেদনটা পুরো উপন্যাস জুড়ে থাকে না। মেলোড্রামা আর মেলোড্রামা। আর তা এক পর্যায়ে গিয়ে ট্রাজেডিতে পর্যবসিত হয়।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। ধরা যাক, হ্যামলেট আমরা পড়ি নি। অথচ আমরা কিন্তু হ্যামলেটের গল্প জানি। কীভাবে? নানা মিডিয়ায় হ্যামলেটের অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে। সেটা বলিউডি মুভি হায়দারও হতে পারে। আবার হতে পারে আরো অন্য রকম প্রেজেন্টেশন হিসেবে লায়ন কিংও। এই পোস্টমডার্ন যুগে যখন আমরা সিমুলেশনেরও সিমুলেশন দেখছি, তখন খুব কম ক্লাসিক গল্পই আসলে একদম নতুন কিছু মনে হতে পারে। ধ্রুপদী সাহিত্য আসলে আমাদের এমন কোনো কিছু অফার করবে না যেটা আমরা একদমই জানি না। বরং এই সিমুলাক্রার (সিমুলেশন অফ সিমুলেশন) যুগে কোনো না কোনোভাবে গল্প রি-সার্কুলেট করে। সপ্তপদীর গল্পটা তাই খুব নতুন নাহলেও, ক্রাইসিসটা আমাদের চেনাপরিচিত হলেও সময়ের বিচারে এই ডাইমেনশনটা এক্সপ্লোর করবার জন্য সপ্তপদী বেশ মডার্ন একটা অ্যাপ্রোচ ছিল।

ତୁଳନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥଃ

- ୧) ସମ୍ପଦୀ- ତାରାଶଙ୍କର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ
- ୨) ସେହି ସମୟ- ସୁନୀଲ ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ
- ୩) ଆଶାର ଦୁଲନେ ଭୁଲି- ଗୋଲାମ ମୁରଶିଦ

উপসংহারঃ

- তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস সপ্তপদী। রঢ় বাংলার একটি মাস্টারপিস গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে স্রোতের অভিমুখ পরিবর্তনকারী একটি মহাগ্রন্থ।